Trisangam International Refereed Journal (TIRJ)
A Peer Reviewed Research Journal on Language, Literature & Culture's
Volume –2, Issue-iii, published on July 2022, Page No. 324–331
Website: https://www.tirj.org.in, Mail ID: trisangamirj@gmail.com
e ISSN : 2583 – 0848 (Online)

ড. দীপক চন্দ্রের 'বিভীষণ' বিনির্মাণের আলোকে

ড. তালু বেসরা
সহকারী অধ্যাপক, বাংলা বিভাগ
রায়গঞ্জ বিশ্ববিদ্যালয়
ই-মেইল : talubesraru@gmail.com

Keyword
বিনির্মাণ, পুনঃনির্মাণ, পুরাণ-মানুষ, ঘরশত্রু, বিশ্বাসঘাতক, রাজনীতি শ্রেণি সংঘাত, বীরধর্ম, মিথ, স্বজাতিদ্রোহী

Abstract
রামায়ণের অন্যতম চরিত্র বিভীষণ। রামায়ণ বলতে আমরা রাম-রাবণের যুদ্ধ মহাকাব্য বলে থাকি। কিন্তু এই কাহিনির পেছনে অন্যতম একটি চরিত্র বিভীষণ। রামের পক্ষে বিভীষণ না থাকলে কিছুতেই রাবণ ও রাবণের সাম্রাজ্যকে ধ্বংস করা সম্ভব হত না। রাবণের পর লঙ্কার স্বর্ণ সিংহাসনে বিভীষণ রাজা হয়ে বসার পরে লঙ্কার রাজনীতির হাল কী হলো আদি কবির মহাকব্যে তার কোনো বিবরণ নেই। শুধুমাত্র রামচন্দ্র যখন অশ্বমেধ যজ্ঞ করলেন তখন বিভীষণ সেই মহাযজ্ঞের একজন সম্মানিত অতিথি রূপে অযোধ্যায় উপস্থিত ছিলেন। এই প্রসঙ্গ ছাড়া বিভীষণের আর কোন কথা উল্লেখ নেই। অথচ লঙ্কার রাজা হয়ে বিভীষণের দশা কী হল সে কথা জানার জন্য কৌতূহল হওয়া খুব স্বাভাবিক। এই কৌতূহল নিবৃত্ত করার লক্ষ্যে ড. চন্দ্র রামায়ণে যা আছে এবং নেই তা নিয়েই এক নব রামায়ণের ধারা সৃষ্টি করলেন। রামায়ণের মহিমা বজায় রেখে বলা যেতে পারে লেখক বিভীষণকে নতুন করে বিনির্মাণের আলোকে তুলে ধরলেন। ফলে মিথের পুনঃনির্মাণ আলোচ্য উপন্যাসে এক নতুন মাত্রা পায়।

Discussion
ভারতীয় সংস্কৃতির মানসগঙ্গোত্রীর উৎসভূমিতে রয়েছে রামায়ণ ও মহাভারত। এই দুই মহাকাব্যের হাত ধরে যুগে-যুগে কালে-কালে ভারতীয় সাহিত্যধারা নানাভাবে পুষ্টিলাভ করেছে। ভারতীয় নন্দনতত্ত্বের চিরাভ্যস্ত বিধান 'রামাদিবৎ প্রবর্তিতব্যং'কে অমান্য করে মাইকেল মধুসূদনই প্রথম প্রচলিত ধারা থেকে সরে এসে রামের তুলনায় রাবণকে মহত্তর মহিমায় অন্বিত করেছিলেন। একালের পুরাণকাহিনি-আশ্রিত নূতন সৃষ্টিগুলির প্রবণতা বিশ্লেষণ করলেও দেখা যায়, বির্নির্মাণ ও পুনর্নির্মাণ মধ্যদিয়ে লেখকেরা তাঁদের সৃষ্টিকে নানা ধরণের মাত্রাবিন্যাস করেছেন। আর এই ধারায় ড. দীপক চন্দ্র একালে পুরাণ চর্চার ধারাটিকে একটি স্বতন্ত্রখাতে প্রবাহিত করে তার অন্তর্নিহিত স্বরূপ অণ্বেষণে যুক্তি-তথ্যের আশ্রয়ে অসামান্য সৃষ্টিশীল বয়ান গড়ে তুলেছেন। তিনি একান্ত নিজস্ব ঘরানা তৈরি করেছেন, যেখানে পৌরাণিক পটভূমি ও চরিত্র অধ্যায়ণের মধ্যদিয়ে নব ভাবশৈলীতে সজ্জিত করে মৌলিক চিন্তার বীজ বপন করেছেন।

প্রাচীন সম্পদকে কিভাবে আধুনিক জীবন জিজ্ঞাসার নিরিখে, আধুনিক সময়, সমাজ ও মূল্যবোধের পটভূমিতে স্থাপন করে নবতর চিন্তার দিশারী করে তুলতে হয় তা তাঁর আখ্যান চয়নেই পরিচয় মেলে। এ প্রসঙ্গে প্রাবন্ধিক ড. সুমিতা চক্রবর্তী বলেছেন—

> "দীপক চন্দ্রের প্রধান কৃতিত্ব এখানেই— বতর্মানের নৈতিকতা, মূল্যবোধ ও সমাজ-বাস্তবতার দৃষ্টিকোণ থেকে উপস্থাপিত করবার চেষ্টা করেছেন তিনি পুরাণের চরিত্রগুলিকে। এখানেই তাঁর নিজস্বতা। অর্থাৎ 'এখন মানুষ'-এর ছাঁচে ঢেলে নেবার কাজ করতে চেয়েছেন 'পুরাণ-মানুষ'-এর সারাৎসারকে। সর্বত্রই নয় হয়তো, কিন্তু বহু ক্ষেত্রেই তাঁর প্রয়াস সার্থক।"[১]

তিনি তাঁর লেখার বয়ানের মধ্যদিয়ে শাশ্বত চিরন্তন সত্যকে যুক্তির বেড়াজালে ও পুনরাবিষ্কারের মধ্য দিয়ে কালোত্তীর্ণ স্বরূপকে উন্মোচন করেছেন। দেশ-কাল-সমাজ-অর্থনীতি-রাজনীতির পরিপ্রেক্ষায় পৌরাণিক আখ্যানকে নবায়ন রূপ দিয়েছেন। মাইকেল মধুসূদন তাঁর 'মেঘনাদবধ কাব্যে' মেঘনাদের জবানিতে, 'নিজগৃহপথ তাত দেখাও তস্করে'-- ওইটিই হল ভারতীয় ভাবনায় বিভীষণ সর্ম্পকে বিমুখতার স্বরূপ। লেখক নিজেও 'আত্মকথন'এ বলেছেন—

> "আমার লেখার বিষয় হল পৌরাণিক উপন্যাস। উপকরণ যুগিয়েছে রামায়ণ মহাভারত। গতানুগতিক সাহিত্যধারার বাইরে এবং দেশকালের সঙ্গে সম্পৃক্ত এক নতুন জীবনবোধ সৃষ্টির উদ্দেশ্য নিয়ে রামায়ণ মহাভারতের মতো জনপ্রিয় মহাকাব্যের সংঘাত-সংকুল রাজনৈতিক এবং সামাজিক জীবন নিয়ে একালের প্রেক্ষাপটে সেকালের জীবনকে পুনর্নির্মাণ করে আজকের উপন্যাসের রূপান্তরিত করেছি।"[২]

রামায়ণের একটি অন্যতম চরিত্র বিভীষণ। বিভীষণ চরিত্রের কথামুখ এলেই পাঠক মনে এক বিশেষ প্রসঙ্গ মনে পড়ে 'ঘরশত্রু বিভীষণ', 'বিশ্বাসঘাতক বিভীষণ'। পৌরাণিক কাহিনি মতে বিশ্রবার ঔরসে নিকষা বা কৈকসী গর্ভে বিভীষণ জন্মগ্রহণ করেন। বিভীষণের অপর দুই ভাইয়ের নাম রাবণ ও কুম্ভকর্ণ, স্ত্রীর নাম সরমা। দুটি সন্তান— পুত্র তরণীসেন ও কন্যা কলা। যিনি না- থাকলে রামের পক্ষে কিছুতেই রাবণ ও রাবণের সাম্রাজ্যকে ধ্বংস করা সম্ভব হত না, তিনি 'একমেব অদ্বিতীয়ম' বিভীষণ। রামায়ণের এই চরিত্রকে সমানে রেখে ড. চন্দ্র আখ্যান গড়ে তুলেছেন। যে আখ্যানের প্রেক্ষণবিন্দুতে রয়েছে বিভীষণের অজানা কাহিনিবৃত্ত। লঙ্কায় রাজা হওয়ার পরে বিভীষণ প্রসঙ্গে রামায়ণে বিশেষ বিবরণ নেই। একমাত্র লঙ্কাকাণ্ড হওয়ার পর রামচন্দ্র যখন অশ্বমেধ যজ্ঞের আয়োজন করেন তখন বিভীষণ সেই মহাযজ্ঞের একজন সম্মানিত অতিথি রূপে অযোধ্যায় উপস্থিত ছিলেন এইটুকু মহাকবি বাল্মীকি উল্লেখ করেছেন। এর বেশি কিছু রামায়ণে আমরা পাই না। অথচ এই চরিত্রকে নিয়ে পাঠকমনে কৌতূহলের শেষ নেই। এই কৌতূহলকে নিবৃত করার প্রয়াস ড. দীপক চন্দ্র আলোচ্য 'বিভীষণ' উপন্যাসের আখ্যানবৃত্ত গড়ে তুলেছেন। যে আখ্যানের বয়ানে ড. চন্দ্র রামকথার কাহিনিসূত্রকে এক নতুন ভাবনার মোড়কে উপস্থাপন করেছেন। ঔপন্যাসিক 'দৃষ্টিকোণ' অংশে বলেছেন—

> "রামায়ণে যা আছে এবং নেই তা নিয়েই এক নব রামায়ণ সৃষ্টি হয়েছে আমার উপন্যাসে। রামায়ণের মহিমা বজায় রেখে বলা যেতে পারে বিভীষণকে নতুন করে সৃষ্টি করা হয়েছে। সমাজ বাস্তবতার প্রেক্ষাপটে তাকে নতুন করে চিনে নিতে পারবে পাঠকবৃন্দ। অতি প্রাচীন কালের সমাজ ও রাজনীতি শ্রেণি সংঘাতের বীজ উত্তপ্ত ছিল তাকে বিভীষণের রাজ্যশাসনের মধ্যে অনুভব করতে চেষ্টা করেছি। ফলে মিথের পুনঃনির্মাণ এখানে এক নতুন মাত্রা পায়। বিভীষণ তখন কোনো একজন ব্যক্তি বা চরিত্র নয়, একটা প্রতীক।"[৩]

রামায়ণে রাম-রাবণের যুদ্ধে রাবণের মৃত্যু হয়েছে। রাবণের মৃত্যুতে একদিকে লঙ্কাযুদ্ধের যবনিকা পড়ল, অপরদিকে বিভীষণের স্বপ্ন— মন্দোদরী ও লঙ্কার সিংহাসন এখন বাস্তব সত্য হয়ে প্রতিপন্ন হতে লাগল। বিভীষণের দীর্ঘ বাসনা ও তাঁর মনের অন্তরে লালায়ীত কামনা আজ যেন বাস্তবের পথে। মন্দোদরী ছাড়া রাবণের আর কেউ বেঁচে নেই, তাকে নিয়ে বসে অছে শূর্পনখা। রাবণের নিশ্চিহ্ন হয়ে যাবার সঙ্গে সঙ্গে লঙ্কার সিংহাসনে বিভীষণের অভিষেক হবে। আর পুরনো প্রথা মতে মন্দোদরীকে বিভীষণের মহিষী সেজে বসতে হবে তার পাশে। এসব কথা ভেবে মন্দোদরীর বুকখানা হু-হু করে উঠল, স্বামী রাবণের কথা মনে পড়ল। অন্ত্যেষ্টি ক্রিয়া সমাপনান্তে বিভীষণ জানান, দেবী এবার

আমাদের রাজপ্রাসাদে ফিরতে হবে। শিবিকার মধ্যে মন্দোদরী এখন একা, আর একাকীত্বে মানুষ নিজের মনের সঙ্গে অবিরাম কথা বলে। মন্দোদরীর জীবনেও অতীত দিনের কথাগুলি দৃশ্য-ঘটনা-সংলাপ সবই চোখের আয়নায় বিম্বিত হতে লাগল। মন্দোদরী আধো ঘুম ও আধো জাগরণের মধ্যে রাবণকে দেখতে পেয়ে অভিযোগ জানিয়েছেন--

> "জীবনে তুমি সব পেয়েছ। ...তুমি একজন বড় মাপের মানুষ শুধু নয়, একজন শ্রেষ্ঠ সম্রাট। আমারও ধরাছোঁয়ার বাইরে। কিন্তু নারীহরণের মতো এক জঘন্য কাজ করে নিজের গৌরব ও মর্যাদাকে ধুলো-মাটির মধ্যে টেনে এনেছ। সীতাহরণ তোমার উচ্চাকাঙ্ক্ষার এক কলঙ্ক। এক ভুল রাজনীতির সঙ্গে নিজেকে জড়িয়ে তোমার অস্তিত্বটাই বিপন্ন করে তুলেছ।"[৪]

এই কথা শুনে রাবণের অধরে মলিন হাসি ফুটল। এক গভীর অপরাধবোধ থেকে বলে উঠল, 'নারী হরণের ঘটনায় তুমি আঘাত পেয়েছ। কিন্তু নারী হরণ তো নতুন ঘটনা নয়। নরপতিরা পৌরুষ দেখাবার জন্য বীর্য বলে নারী হরণ করে, বীরধর্ম পালন করে।' এজন্যে অনুতাপের কোনো কারণ হতে পারে না। রাবণের কাছে রামচন্দ্রের প্রতারণার দিকটি স্পষ্ট হলো—

> "এজন্য অনুতাপ, অনুশোচনা করবো কেন ? বিশেষ করে সে যখন সত্যিকারের সীতা নয়। ছায়া সীতার পিছনে রাম না দৌঁড়লে তো কোনও সমস্যাই হত না। রামচন্দ্রই মিথ্যে সীতা সাজিয়ে আমাকে প্রতারণা করে একটা রাজনীতি করেছে আমার সঙ্গে। রামচন্দ্রই একটা ন্যায্য ব্যাপারকে রাজনৈতিক মর্যাদার লড়াই করে তুলেছে।"[৫]

কথাকার এক বাস্তব দৃষ্টিভঙ্গিতে রাজনৈতিক প্রসঙ্গ এনে পাঠক মহলে ভাবনার দিককে প্রসারিত করে, মিথকে পুনঃভাবনার স্তরে পৌঁছে দিয়েছেন। দীপক চন্দ্রের এই ছায়া সীতা প্রসঙ্গ বিভিন্ন পুরাণে সমর্থন মেলে। মারীচ বধের আগমুহূর্তে দণ্ডকারণ্যে দেবদূত অগ্নি এসে রামকে বলেন—

> "সীতা হরণের কাল উপস্থিত হইয়াছে... অতএব আপনি... সীতাকে আমার নিকট অর্পণ করুণ, নিজ সমীপে ছায়া রূপিণী সীতাকে রাখুন। পুর্নবার অগ্নি পরীক্ষা সময়ে আপনাকে সীতা প্রদান করিব। এই জন্য দেবগণ আমাকে প্রেরণ করিয়াছেন।"[৬]

মন্দোদরী আধো ঘুমের মধ্যে বললেন, রামচন্দ্র তো অনেককাল ধরে ফাঁদে ফেলতে চায়েছে। জেনেশুনে তার ফাঁদে পা দিলেন কেন? রাবণ বললেন আমি তো তেরো বছর ধরে মুখ বুঝে রামের ষড়যন্ত্র মুখ বুঝে মেনে নিয়েছি। কিন্তু শূর্পনখার অপমান মুখ বুঝে সহ্য করলে লোকে আমাকে নিন্দে করত, ভীরু এবং কাপুরুষ বলত। রাবণের মুখে রামের কথা শুনে মন্দোদরী ঘুমের মধ্যে চিৎকার করে ওঠে, ওই বিশ্বাসঘাতিনীর নাম উচ্চারণ কোরো না। লঙ্কার ধ্বংসের জন্য, সকলের সর্বনাশের জন্য, পুত্রদের বিয়োগের জন্য, সর্বোপরি আমার দুর্ভাগ্যের জন্য ওই কালনাগিনী দায়ী।

মন্দোদরীর কক্ষে একজন সৈরিন্ধী সজ্জিত হওয়ার সামগ্রী দিয়ে নতমস্তকে প্রণাম জানিয়ে অভিষেক অনুষ্ঠানে যাওয়ার নির্দেশ দিয়েছেন। সরমা মন্দোদরীকে জানান, আগুন রঙ ওর প্রিয় রঙ। কাপড়টা পরলে তোমাকে ভীষণ সুন্দর লাগবে। মন্দোদরীর মনে হল কাপড় তো নয় আগুন যেন। বস্ত্রের এক প্রান্ত থেকে অন্য প্রান্ত পর্যন্ত লঙ্কার যুদ্ধের পরিবেশ সৃষ্টি করেছে। এবার সরমা নিজের অন্তরের বেদনা বিষ দৃষ্টিতে প্রকাশ করে বললেন—

> "আর কেউ না জানলেও আমি তো জানি ও তোমাকে ভালোবাসে। তোমরা দুজনা ভালোবাসো দু'জনকে। তুমি একটু চাইলেই ও রামচন্দ্রের সঙ্গে আঁতাত করতে পারত না। শুধু তোমাকে সম্পূর্ণ পাওয়ার জন্য রামচন্দ্রের পক্ষে যোগ দিয়েছিল। হয়তো মনে মনে তুমিও চেয়েছিলে।"[৭]

দীপক চন্দ্র রামায়ণের প্রচলিত ধারণা থেকে সরে এসে মন্দোদরীর মনের অন্তরের ভাষাকে কথারূপ দেওয়ার মধ্য দিয়ে পাঠকের চিন্তন জগতে ভাবনার উদ্রেককে জাগিয়ে তুলেছে সময়ের প্রেক্ষাপটে। দীপকবাবু এখানে বিভীষণের

বিশ্বাসঘাতকতার ব্যাপারটির পিছনে সম্পূর্ণ ভিন্ন উপলক্ষের অবতারণা করেছেন। বৌদির প্রতি এই দুর্বার আকর্ষণের জন্যই বিভীষণকে দাদা রাবণের বিনাশের জন্য তাঁর বিরুদ্ধে দাঁড়াতে প্ররোচিত করেছে। খুব সংক্ষেপে বিভীষণের অভিষেক হয়ে গেল। লঙ্কার শূন্য সিংহাসনে বিভীষণকে বসিয়ে দিল রামচন্দ্র। মহারানির আসনে মন্দোদরীকে। রামচন্দ্র বিভীষণের হাতে রাজদণ্ড তুলে দিয়ে ঘোষণা করেন— যখনই লঙ্কাবাসী সংকটে পড়বে তখনই আপনাদের পাশে দাঁড়াতে ত্রুটি হবে না। আর চোখের সামনে যারা করতালি দিয়ে বিভীষণকে সংবর্ধিত করেছে এবং সাধুবাদ জানিয়েছে– ওরা কেউ স্বজন নয় তার। সকলেই বিদেশি, এদেশের মাটির সঙ্গে এদের কোনো সম্পর্ক নেই। এমনকি বিভীষণের পাশে তার পুত্ররাও নেই। উৎসবের পরিবেশ নেই লঙ্কায়, তবু নতুন রাজাকে প্রজাদের স্বচক্ষে দুঃখ দুর্দশা জনার জন্য পরিভ্রমণে বেরোতে হল। বিভীষণের নতুন অভিজ্ঞতা সঞ্চয় করলেন, নতুন রাজাকে দেখার কোনো কৌতূহল নেই। রাজা-রানির ফুলমালা দেবার জন্যে কোনো লোক নেই পথে, এমনকি একটা ভিখারিকেও দেখা গেল না। বিভীষণ চলার পথে অনুভব করলেন প্রবল জন বিদ্বেষ, ঘৃণা ও অন্তরের রাগ। বিভীষণকে লক্ষ্য করে এক যুবক চিৎকার করে প্রবল ঘৃণার সঙ্গে বলে ওঠে, 'ওই লোকটা লঙ্কার কেউ নয়। দেশের শত্রু। জাতির কলঙ্ক'।

একটা ঘোরের মধ্যে প্রাসাদে ফিরলেন বিভীষণ। মাথা হেঁট করে গৃহে প্রবেশ করলেন। পুরবাসীদের অপমান সে ভুলতে পারেন নি। মনে মনে নিরুচ্চারে ভাবলেন, রাজত্ব গিয়ে এই বিদ্রোহী জনতাকে শায়েস্তা করা প্রয়োজন। আর এতে যদি মৃত্যু হয় তাহলে বীরগতি লাভ করবে। এতে সে ভোগ করবে লঙ্কাকে, মন্দোদরীকে।

রামচন্দ্রের আহ্বানে বিভীষণের মন্ত্রণাকক্ষে একে একে হাজির হলেন সুগ্রীব, হনুমান, জাম্বুবান, নীল, অঙ্গদ। সবশেষে, সম্পাতি, অনিল, অনল, পনসের সঙ্গে প্রবেশ করলেন বিভীষণ। বিভীষণের সংক্ষিপ্ত ভাষন শেষ হলে রামচন্দ্র সভাস্থ ব্যক্তিবর্গের উদ্দেশ্যে বললেন, বিভীষণ আমার বন্ধু। তার সাহায্য না পেলে লঙ্কানগরী জয় করা সহজ হত না। যুদ্ধ বিধ্বস্ত লঙ্কার ক্ষতগুলি আরোগ্য সর্বাগ্রে দরকার। মিত্র বিভীষণের পাশে আমাদের সকলকে হাতে হাত মিলিয়ে কাজ করার আহ্বান জানান। গতকাল নগর পরিক্রমণের অভিজ্ঞতা বিভীষণের সুখের হয়নি। চক্রান্তকারীদের হাতের অস্ত্র অকেজ করে দিতে হবে। রামচন্দ্র এই কাজটি সুসম্পন্ন করার জন্য হনুমানের উপর অর্পণ করলেন। সকলের পরামর্শে বিভীষণের মনে একটু শক্তি সঞ্চার হল। কিন্তু দেশের উন্নয়নের জন্য চাই বিপুল অর্থ। রাজকোষে অর্থ কোথায়? অর্থ আসবে কথা থেকে সে সম্পর্কে কেউ কিছু না বলে, কৌশলে বিষয়টা সকলে এড়িয়ে যাচ্ছে। অথচ, সংকট থেকে পরিত্রাণের জন্য সবচেয়ে বেশি প্রয়োজন অর্থনৈতিক সাহায্য। বিভীষণ কৌশলে রামচন্দ্রের কাছে সুস্পষ্ট ভাবে আর্থিক সাহায্যের প্রতিশ্রুতি দাবি করলেন। আর রামচন্দ্রও বাধ্য হয়ে পূর্ণ সহযোগিতার আশ্বাস দিতে বাধ্য হলেন। বিভীষণ মাঝে মাঝে মন্দোদরীর ব্যবহারে দুঃখিত বোধ করেছেন। বিভীষণের দুঃখে মন্দোদরীর কাছে কোনো প্রতিক্রিয়া পাওয়া যায়নি। অথচ বিভীষণ যা কিছু করেছে নিজের কাছে, দেশের কাছে তা মন্দোদরীর জন্য করছে। বিভীষণের ভুলটা এখন খালি চোখে স্পষ্ট দেখতে পান। মন্দোদরীর স্নেহবৎসল অন্তঃকরণকে তার প্রতি গভীর অনুরাগ ও প্রেম বলে ভুল করেছিল। সে ভুলের অনেক দাম দিতে হল তাকে। লঙ্কার ভবিষ্যৎ তাকে শঙ্কিত করে তুলেছে।

বিভীষণ একা শুয়ে মনের অন্দর থেকে পুঞ্জীভূত অভিমান, একাকীত্বের কষ্ট, যন্ত্রণামথিত দীর্ঘশ্বাস পাক দিয়ে দিয়ে বেরিয়ে এল। ভগবানের কাছে প্রশ্ন, কেন এই কলঙ্ক? বিভীষণ বুঝতে পেরেছে প্রত্যেকটি অবস্থার মধ্য দিয়ে মানুষ না গেলে জীবনের অভিজ্ঞতা পূর্ণ হয় না। একদিন যেটাকে অভ্রান্ত ভেবে নিশ্চিত সত্য মনে করেছিল আজ সেটাকে বড় ভ্রান্তি বলে মেনে নিতে হচ্ছে। বিভীষণ মনের অন্তঃকরণে প্রবেশ করে খোঁজার চেষ্টা করলেন। আজ চিন্তার মধ্য দিয়ে নিজের মধ্যে প্রবেশ করে শুধু নিজকে নয় অনেককে দেখতে পেলেন। রাবণ সভাসদের মাঝে বিভীষণকে প্রশ্ন করলেন, রামচন্দ্রের নানারকম যুদ্ধের হুমকি শোনা যাচ্ছে, একথা সত্য বলে মনে হয় কি বিভীষণ? খর ও দূষণের মৃত্যুর পর রামচন্দ্র লঙ্কা আক্রমণের কথা ভাবছে। রামচন্দ্রের এত সাহস হয় কী করে? বিভীষণ নিজের সমর্থনে উত্তর দেন, তোমার ভুল রাজনীতির সুযোগ নিয়ে কূটকৌশলে প্রতিনিয়ত তোমার মনের অভ্যন্তরে সংঘাতের জমি প্রস্তুত করতে সফল হয়েছে। সন্দেহ অবিশ্বাস তোমাকে গ্রাস করেছে। রাবণ ভ্রূ কুঁচকে বিরক্ত হয়ে বললেন, অশ্চর্য তোমার যুক্তি। রাবণ বললেন, আমি স্পষ্ট দেখতে পাচ্ছি, তোমার দু'চোখে লোভ মনে কুমতলব কাজ করছে। তুমি না বললেও

আমি টের পাই, লঙ্কার সিংহাসনে আমাকে তোমার পছন্দ নয় আমাকে ঈর্ষা করো। বিভীষণ কয়েকটা মুহূর্ত কিছু বলতে পারলেন না। রাবণ বিভীষণের প্রতি স্পষ্ট অভিযোগ এনে বলেন—

> "এসব কেন করছ জানি না। সিংহাসনের লোভ যদি থাকে খোলা মনে বলো রাজমুকুট খুলে দেব আমি। অথবা লঙ্কার শাসনাধীন কোন অঞ্চলের নরপতি দেব তোমায়। কিন্তু ভাই ভুলেও দেশের প্রতি বিশ্বাসঘাতকতা করে মাতৃহন্তা হয়ো না। এর মতো বড় পাপ এবং অভিশাপ আর নেই। মানুষের শাপ-মন্ত কুড়িয়ে তুমি শান্তি পাবে না। সিংহাসন হব এ তোমার কণ্টক আসন। জীবনের সব শান্তি নষ্ট হবে।"[৮]

হঠাৎ কোকিলের সুমধুর ডাকে বিভীষণের চোখ খুলে জেগে ওঠে।

রামচন্দ্রের সঙ্গে থেকে বিভীষণ বুঝেছিল সাধারণ মানুষের মনে ধর্মের প্রভাব কত গভীর, কত ব্যাপক। বিভীষণ যুদ্ধক্ষত লঙ্কানগরীকে পুনর্নির্মাণের লক্ষ্যে ধনী ব্যবসায়ী, বিত্তবান এবং অভিজাত প্রমুখ রাজনীতির বাইরের ব্যক্তিবর্গকে আহ্বান জানালেন। বিভীষণ সরাসরি দেশ গঠনের জন্যে এগিয়ে আসতে অনুরোধ জানান। আপনারা চাইলে এই দেশ আবার সোনার দেশ হয়ে উঠতে পারে। বিভীষণ সহজাত বুদ্ধি দিয়ে বুঝলেন লঙ্কার উপর রাজনৈতিক কর্তৃত্ব বজায় রাখতে হলে বর্তমান ও ভবিষ্যতের কথা ভেবেই তাকে জনতার দাক্ষিণ্য ত্যাগ করে এই সব ব্যক্তিদের সঙ্গে হাত মেলাতে হবে। বিভীষণের চির অকাঙ্খা মনের অজান্তে কে যেন বলে উঠল– আমি চাই সাম্রাজ্য, চাই প্রভুত্ব, যশ, মান, খ্যাতি। আমি চাই প্রজাদের ভালোবাসা, তাদের হাত থেকে গলা ভর্তি ফুলের মালা। কিন্তু কে যেন বুকের ভেতর থেকে ব্যঙ্গ করে এক প্রশ্নবান ছুড়ে বললেন। মন্দোদরীকে কোন মন্ত্রে জয় করবে পুরুষসিংহ? এখন বিভীষণের কাছে মন্দোদরী এক মরীচিকা। তার জন্য সরমাকে জীবন থেকে হারাতে হয়েছে। নিজেকে নির্বোধ মনে হয়েছে বিভীষণের।

লঙ্কার সর্বত্র এখন পরিবর্তনের ঢেউ। দেখতে দেখতে লঙ্কার শ্রী ও সৌন্দর্য আমূল বদলে গেল। নিজের ভাগ্যকেই বিভীষণ এখন ঈর্ষা করছে। গর্ব হলো বিভীষণের। লঙ্কাকে সমৃদ্ধ করেছে কে– রাবণ না বিভীষণ? ইন্দ্রের অমরাবতীও বিভীষণের লঙ্কার কাছে হার মেনে যায়। রাবণের লঙ্কাকে নতুন দিগন্তে ফেরাল বিভীষণ। এটাই তার কৃতিত্ব। বিভীষণ নিজের জীবনের পূর্ববর্তী ঘটনার পর্যালোচনা করতে করতে অনুভব করতে পেরেছিল মানুষ রাবণের কাছ থেকে দূরে সরে যাচ্ছে, তার হাত থেকে মুক্তি চাইছে। মানুষের বুকের কান্না বিভীষণ অনুভব করে বুঝতে পেরেছে তাদের কাছে রাবণের প্রয়োজন ফুরিয়ে গেছে। বিভীষণের মনে হল ভ্রাতৃবৎসল ভাই হিসেবে তার কিছু করণীয় আছে। কিন্তু রাবণ নামের পাশে সে একেবারেই নিষ্প্রভ। মাঝে মাঝে সহিষ্ণু বিবেচক মনটা ক্ষুব্ধ হয়। বিদ্রোহ করতে ইচ্ছে হয়। সেজন্য ভ্রাতৃবৎসল বিভীষণ চিৎকার-চেঁচামেচি জুড়ে দিয়ে বললেন, দাদা তোমার ভুল হচ্ছে কোথাও। দাদা, রাক্ষসদের শ্বেতাঙ্গ-বিদ্বেষের ইন্ধন দিয়ে শ্বেতাঙ্গ নির্মূল করার যুদ্ধে শয়ে শয়ে রাক্ষসরা প্রাণ দিচ্ছে। বহু পরিবারের থিত-ভিত ভেঙে পড়ছে। এতে লঙ্কার ক্ষতি হচ্ছে। তুমি এই অভিযান বন্ধ করো। রাবণ শান্ত অথচ থমথমে গলায় বললেন, বিভীষণ তোমার কথা সত্য। বাধা আছে বলেই মানুষ বাধা উত্তরণের জেদ ধরে। এই পথটাকে অতিক্রম করতে আমাদের অনেক মূল্য দিতে হবে, কিন্তু অতিক্রম না করলে কৃষ্ণকায় মানুষদের অন্তরে লুকানো বহুকালের যন্ত্রণা কষ্টের অবসান হবে না। তাদের দুঃখ, কষ্ট, যন্ত্রণা একদিন সকলের কল্যাণ হয়ে গোটা জাতিকে অভিষিক্ত করবে। কথাগুলোর মধ্যে এমন একটা মুগ্ধতা ছিল যে বিভীষণ তর্ক করতে পারলেন না। কিন্তু বিভীষণ দেখেছে, রামচন্দ্র দণ্ডকারণ্যে পদার্পণের পর থেকে এক নতুন সংগ্রাম শুরু হয়েছে নিজের সঙ্গে অন্তরে এবং বাইরে। বিভীষণ সেই প্রথম মনে হল রাবণের আত্মবিশ্বাসের দুর্গে ফাটল ধরেছে। আর লঙ্কাবাসীর বিশ্বাসের জায়গায় সন্দেহ, প্রীতির জায়গায় শত্রুতা, উদারতার জায়গায় বিচ্ছিন্নতা ধীরে ধীরে প্রভাব বিস্তার করতে লাগল। অন্যদিকে তেমনি বিরোধ বাধল ভাইয়ের সঙ্গে ভাইয়ের। স্বামীর সঙ্গে স্ত্রীর, পুত্রের সঙ্গে পিতার। এক বিপর্যয় দেখা দিল সমগ্র লঙ্কাজীবনে। লক্ষ্মণের হাতে তার আপন সহোদরা, শূর্পনখার লজ্জা এবং সম্ভ্রমহানির ঘটনাকে কেন্দ্র করে লঙ্কাবাসী যখন ভীষণ ক্ষুব্ধ, অশান্ত তখনও বিভীষণ নীরব। তরণীসেনও পিতার এমন আচরণে ব্যথিত। তরণীসেন বললেন, দেশটা তো পিতৃব্য রাবণের একার নয়। সমগ্র লঙ্কাবাসীর, সমগ্র দেশবাসীর মর্যাদা জড়িয়ে আছে। কেবল তোমার কোন অনুভূতি নেই। তুমি ভীষণ স্বার্থপর।

নিজের কথা ভাবো শুধু। তোমার মত মানুষেরা এযুগে কৃপার পাত্র। বোধহয়, দেশের বড় শত্রু। বিভীষণ পুত্রের কাছে জানতে চাই, 'অগ্রজ দশাননের কাজে কোন অন্যায় দেখতে পাও?' তরণী সেন বলেন, নিশ্চয় দেখতে পাই—

> "কিন্তু যে দোসের জন্য পিতৃব্যকে দোষী করতে চাইছ, সে অপরাধে অপরাধী নন তিনি। সীতা হরণের জন্য লক্ষ্মণ দায়ী। দোষ রামচন্দ্রেরও। জেনে শুনে সীতাকে সরিয়ে দিয়ে এক অন্য মহিলাকে তার জায়গায় এনে বসিয়েছেন। বিপদের আঁচ পেয়ে আপন স্ত্রীর নিরাপত্তার জন্য যা করেছেন তা দোষের নয়। কিন্তু নকল সীতা হরণের জন্য তার বাড়াবাড়িটা দোষের। সংঘাত বাঁধানোই তার উদ্দেশ্য।"[৯]

তরণী সেনের কথাগুলো রাবণের কথার প্রতিধ্বনি হয়ে বিভীষণের কানে বাজতে লাগল।

রাবণও বিভীষণের কাছে স্বদেশবোধ ও স্বদেশবাসীর কর্তব্যই আশা করেছিল। বিভীষণকে শেষবারের মত খুব কাছে গিয়ে বলল—

> "সাম্রাজ্যলোভী রামচন্দ্র তেরো বছর ধরে অপেক্ষা করে আমাকে ধৈর্য্যচ্যুত করতে পারেনি। আমার ধৈর্যের পাহাড় ফাটল ধরানোর জন্য রাক্ষসদের প্রতি তার অবজ্ঞা, ঘৃণা-বিদ্বেষের বিষ উগরে দিল। প্রথমে অয়োমুখী, তারপর শূর্পনখাকে দিয়ে জঘন্য নারী লাঞ্ছনার এক নজির স্থাপন করে রামচন্দ্র আমাকে সংঘাতের পথে টেনে আনল। সংঘাত রামের সৃষ্টি। তবু, তুমি ছায়াসীতাকে রামের হাতে অর্পণের জন্য জেদাজেদি করছ। তাকে অর্পণ করলেও রাম তাকে পুনর্বার গ্রহণ না করে, নানারকম অপবাদ দিয়ে তার ও আমার চরিত্র হনন। করবে। যুদ্ধ বন্ধন হবে না কিন্তু আমি অনেক কিছু হারাব।"[১০]

শেষে বাধ্য হয়ে রাবণ বিশ্বাসঘাতকতা, দেশদ্রোহী, স্বজাতিদ্রোহী বিভীষণকে লঙ্কা ছেড়ে যেতে আদেশ করেন।

এদিকে যুদ্ধের উন্মদনার মধ্যে সকলের নজর ফাঁকি দিয়ে রামের চর হয়ে হনুমান সাধুর ছদ্মবেশে বিভীষণের সঙ্গে আলাপ করে রামচন্দ্রের পক্ষ থেকে বন্ধুত্বের আমন্ত্রণ জানায়। আর বিভীষণও দুটি শর্তে রামের সঙ্গে– হাত মেলায়, ১) লঙ্কা জয়ের পর মন্দোদরীকে তার রানি করতে হবে। ২) লঙ্কার সিংহাসনে তার অভিষেক করতে হবে। বিনিময়ে লঙ্কা জয়ের জন্য সবরকম সাহায্য করতে প্রতিশ্রুতি হল সে। বিভীষণের পরিকল্পনা প্রসঙ্গে প্রাবন্ধিক বলেছেন—

> "বালিকে হত্যা করে রাম যে সুগ্রীবকে কিষ্কিন্ধ্যার রাজা করেছেন, সে খবর বিভীষণ রেখেছেন। তাই বিভীষণ ভেবেছেন এ যুদ্ধে রাবণের মৃত্যু হলে তিনিই লঙ্কার রাজা হবেন। এটাই তাঁর আশা। একথা অবগত হলেন রাম। বুঝলেন বিভীষণের সাধই তার সাধ্য পূরণ করতে পারে। রাম বিভীষণকে দলে নিলেন। 'গৃহভেদী' বিভীষণ রাবণের শত্রুপক্ষে নাম লিখিয়েই জানিয়ে দিলেন— "ভবদগতং হি মে রাজ্যং জীবিতঞ্চ সুখানি চ।" অর্থাৎ এখন আমার রাজ্যলাভ জীবন ও সুখ সবই আপনার উপর। বিনিময়ে বিভীষণ প্রতিশ্রুতি দিলেন— "রাক্ষসানাং বধে সাহ্যং লঙ্কায়াশ্চ প্রধর্ষেণ।" অর্থাৎ 'রাক্ষস হত্যায় সাহায্য করব, লঙ্কার অধিকারে সাহায্য করব।'"[১১]

রাবণের লঙ্কা ত্যাগ করে বিভীষণ রামের পক্ষে যোগ দেওয়ার সঙ্গে সঙ্গে স্বার্থ, লোভ, আকাঙ্ক্ষা মিলে মিশে তাকে এক অন্য বিভীষণ করে তুলল। এসব কথা ভাবনায় বিভীষণের দেহ ক্লান্ত, মন অবসন্ন হয়ে ওঠে।

বিভীষণের দশ বছর শাসন ব্যবস্থায় লঙ্কাপুরীর অনেক চড়াই-উৎরাইয়ের মধ্য দিয়ে স্বদেশের কারিগরিতেই উন্নত হয়েছে, কিন্তু প্রদীপের নিচের অন্ধকার নিয়ে ভাবায়। সুষ্ঠু রাজ্য পরিচালনার স্বার্থে রাক্ষসক্ষমতার বিকেন্দ্রীকরণ নীতিতে ধনী ও দরিদ্রের প্রভেদ অনেক বেড়ে গেছে। আর মাল্যবানের ভগিনী অনিলার পুত্র চন্দ্রগুপ্ত সরাসরি বিভীষণের শাসন ব্যবস্থা সম্পর্কে অভিযোগ আনেন। রামের লঙ্কা আক্রমণ সাহায্য করার জন্য সুগ্রীবের উপর প্রতিশোধ নিতে দশ বছর আগে তার কন্যা সিংহীকাকে হরণ করেছিল। তারপর নিরুদ্দেশ, হঠাৎ এভাবে উদয় হওয়ার জন্য বিভীষণ একটু উদ্বিগ্ন।

শ্রীরামচন্দ্রের আমন্ত্রণে অশ্বমেধ যজ্ঞ উপলক্ষে পুষ্পকরথে বিভীষণ, মন্দোদরী ও মালির সঙ্গে অযোধ্যা যাত্রা শুরু করেন। বিমান চলছিল, মন্দোদরীর স্মৃতিতে অতীত দিনের নানা ঘটনা মনে পড়তে লাগল। রাবণের সঙ্গে

স্মৃতিভাবনায় রাম-সীতার অনেক অজানা কথা উঠে আসে। রাবণ বললেন, সীতা তো অপহৃত হয়নি। শ্রীরাম নকল সীতাকে মর্যাদার লড়াইয়ের কেন্দ্রে টেনে এনেছেন। সীতার নাম করে নোংরা রাজনীতির আবর্তের মধ্যে টেনে এনে নিজের স্ত্রীর সম্ভ্রম, নারীর মর্যাদা সম্মানকে নোংরা করে তুলল। শুধু ওই মেয়েটার কথা ভেবেই আমি রামের সব স্পর্ধাকে ক্ষমা করেছি। মন্দোদরী বলেন, 'কী হলো তোমার? সীতা না বলে, তাকে মেয়ে বলছ কেন?' এবার রাবণ আবেগ সংবরণ করে সীতার পরিচয় দেন—

> "ওই মেয়ে কে জানো ? আমাদের প্রথম সন্তান। যাকে তুমি বিসর্জন দিয়েছিলে। আমার সেই হারানো মেয়ে সীতা।"[১২]

আমাদের গোড়ায় ভুল না হলে রামের সঙ্গে সীতার বিবাহ হতো না। তোমার আমর ভুলের রন্ধ্র পথ ধরে নিয়তি প্রবেশ করায় আমাদের জীবনে সবই ভবিতব্য। ঔপন্যাসিক সীতার জন্মের নবনির্মাণ ঘটিয়ে এক নতুন কাহিনি শুনিয়েছেন। রাবণ বলেন, 'সেদিন মায়া মমতায় অসহায় শিশু সন্তানকে হত্যা করতে পারিনি। তাই লঙ্কা থেকে অনেক দূরে সাগর-নদী পেরিয়ে মিথিলার এক চাষির ঘরে রেখে এসেছিলাম।' চন্দ্রাবতীর রামায়ণেও সীতার জন্ম কথা নিয়ে এক নতুন মিথের জন্ম দিয়েছিলেন। গণক বলেছেন—

> "অবধান কর আইজ গো রাইক্ষসের নাথ।।
> সুবর্ণ লঙ্কার শিরে গো রাজা,
> আইজ হইল বজ্রাঘাত।।
> এহি ডিম্বে এক কন্যা গো রাজা,
> আইজ লভিল জনম।
> এহি কন্যা হইব গো রাজা,
> স্বর্ণলঙ্কা ধ্বংসের কারণ।।"[১৩]

বিপদের সংকেত পেয়ে গণকের কথা মতো ডিমটিকে সাগরের জলে ভাসিয়ে দেওয়া হয়, পরে এক জেলের জালে ধরা পড়ে ও ঘটানাচক্রকে জনক রাজার গৃহে স্থান পেয়ে ডিম্বক থেকে সীতার জন্ম হয়। আর ড. দীপক চন্দ্রও সীতার জন্মকথায় রাবণ-সীতার পিতা-কন্যার সম্পর্ক দাঁড় করিয়েছেন। মন্দোদরীর স্মৃতিচিন্তা বিভীষণের প্রশ্নতে সর্তক হয়ে উঠলেন। মন্দোদরী বিভীষণকে বলেন, রামের জন্য সীতা কত ত্যাগ করলেন কিন্তু রাম কী মূল্য দিলেন ? সীতাকে কখনও ভালোবাসেনি, শ্রীরামের বুকে তার জন্য এতটুকু প্রেম মমতা ছিল না।

> "রাবণের উপর ক্রোধ মেটাতেই আসন্ন প্রসবা সীতাকে শ্বাপদ-সংকুল অরণ্যে একা ছেড়ে দিতে রামের একটু কষ্ট হয়নি। কেন জান দেবর ? রাবণের মেয়ে বলেই সীতার উপর রামের এত আক্রোশ। অশ্বমেধ যজ্ঞে স্বর্ণসীতা নির্মাণ করে তার অস্তিত্ব মুছে ফেলল।"[১৪]

ইদানীং নিজেকে অসহায় অভিসম্পাতের মতো মনে হয় বিভীষণের। বাতাসে কান পাতলে বিভীষণ শুনতে পায়, রাবণ বীরগতি প্রাপ্ত হয়েছে, তবু চিতা নিভেনি। অনন্তকাল ধরে জ্বলতে থাকবে। অযোধ্যা থেকে ফিরে আসার পরে বিভীষণের মনে হচ্ছে লঙ্কার কোথায় যেন একটা পরিবর্তন শুরু হয়েছে। বিভীষণের দুর্বলতার সুযোগে সামাজিক, রাজনৈতি প্রেক্ষাপটে চন্দ্রগুপ্তের আর্বিভাব। দেশে প্রবল বৈষম্য, দারিদ্র দেখা দিয়েছে, ভয়াবহ সমস্যা মাথাচাড়া দিয়ে উঠেছে। লঙ্কাবাসীর বিদ্রোহের প্রতীক হিসেবে রাবণ-পুত্র মতান্তরে সহস্রমুখ রাবণের পুত্র চন্দ্রগুপ্ত চরিত্রটি অঙ্কন করে দীপকবাবু 'বিভীষণ' উপন্যাসটিকে ভিন্ন মাত্রায় উন্নীত করেছেন। যে বিভীষণ আম -জনতার কাছে রামচন্দ্রের দীন সেবক হিসেবে সমাদৃত তিনি যে আদতে স্বৈরাচারী রাজা ছিলেন এবং তাঁর পতনে লঙ্কাবাসীর মনে আনন্দের বান ডেকেছিল দীপকবাবু তা বিশ্বাসযোগ্য ভঙ্গিতে দেখিয়েছেন। চন্দ্রগুপ্তের নেতৃত্বে ক্ষিপ্তজনতার বুকে জমে থাকা ক্রোধ আক্রশ গর্জন মুখর একটা কথা—

> "দেশ কারও পৈতৃক সম্পত্তি নয়। যা খুশি, যেভাবে খুশি ইচ্ছেমাফিক একে ব্যবহার করা যায় না। জনগণের ইচ্ছে-অনিচ্ছেরও একটা দাম আছে। একতরফা ক্ষমতার অধিকারী হয়ে শিল্পকান্ত, চন্দ্রগুপ্ত কিংবা বিভীষণের মতো স্বেচ্ছাচারী, অযোগ্য, অপদার্থ শাসকের অপশাসন থেকে নিষ্কৃতি চাই। জনগণই দেশের শেষ কথা।"[১৫]

দীপক চন্দ্র বিভীষণের রাজ্যশাসনের ও রাজসিংহাসনে আরোহণের পরের ঘটান আমরা রামায়ণে পাই না। ঔপন্যাসিক সৃষ্টিশীলতার আশ্চর্য দক্ষতায় ও কল্পনার মানসতটে মিথের পুনঃনির্মাণ করেছেন। আচার্য জগদীশ ভট্টাচার্য যর্থাথই বলেছেন, ড. চন্দ্র কথাসাহিত্যের ভাষায় ভারতীয় মহাকাব্যের আত্মাকে স্পর্শ করেছেন। লেখক যে কবিমন নিয়ে ও মানবিক দৃষ্টিভঙ্গির প্রতিবাদী উত্তরাধিকারী বহণ করে বাংলা সাহিত্যে বির্নির্মাণ করেছেন, তাতে তিনি নিজস্ব এক স্বতন্ত্র্য সাম্রাজের অধীশ্বরী হয়ে উঠেছেন। দীপকবাবু তাঁর প্রতিটি উপন্যাসে পুরাণের এক-একটি চরিত্রকে অবলম্বন করে পুনর্মূল্যায়িত করেছেন। যা আলোচ্য উপন্যাসের রাজনৈতি-অর্থনৈতিক-সমাজিক ওঠাপড়া আর তার পাশাপাশি ব্যক্তমানসের দ্বন্দ্ব-সমন্বয়ে নতুন আলোকে, নতুন মূল্যয়নে বিভীষণ চরিত্রটি সত্যিই অনন্য-ব্যতিক্রমী হয়ে উঠেছে।

তথ্যসূত্র :

১. সেনগুপ্ত, পল্লব, চক্রবর্তী, সুমিতা, বন্দ্যোপাধ্যায়, রবীন্দ্রনাথ, গিরি, ড. সত্যবতী, সম্পাদকমণ্ডলী, পুরাণদর্পণে দীপক, দে'জ পাবলিশিং, কলকাতা-৭৩, প্রথম প্রকাশ, ডিসেম্বর, ২০০৮. পৃ. ১২১
২. তদেব, পৃ. ২৯৫
৩. বিভীষণ, দীপক চন্দ্র, প্রথম দে'জ সংস্করণ, দে'জ পাবলিশার্স, ডিসেম্বর, ২০০৫, 'দৃষ্টিকোণ অংশ', পৃ. ৫
৪. তদেব, পৃ. ১৩
৫. তদেব, পৃ. ১৩
৬. মিত্র, বীরেন্দ্র, রামায়ণে দেবশিবির, প্রথম প্রকাশ, ১৯৮৯, নাথ ব্রাদার্স, কলকাতা-৭৩, পৃ. ১৪৪
দ্র. ব্রহ্মবৈবর্ত পুরাণ, প্রকৃতি খন্ড, ১৪শ অ দ্র., নবভারত পাবলিশার্স
৭. বিভীষণ, দীপক চন্দ্র, প্রথম দে'জ সংস্করণ, দে'জ পাবলিশার্স, ডিসেম্বর, ২০০৫, পৃ. ১৭
৮. তদেব পৃ. ৫২-৫৩
৯. তদেব, পৃ. ৬২
১০. তদেব, পৃ. ৬৫
১১. বন্দ্যোপাধ্যায়, অনির্বাণ, ভিন্নপাঠে রামায়ণ, সিসৃক্ষা প্রকাশনা, প্রথম প্রকাশ, মাঘ ১৪২৪, পৃ. ১৮৬-১৮৭
১২. বিভীষণ, দীপক চন্দ্র, প্রথম দে'জ সংস্করণ, দে'জ পাবলিশার্স, ডিসেম্বর, ২০০৫, পৃ. ৯৫
১৩. চক্রবর্তী, কোয়েল, চন্দ্রাবতীর জীবন ও রামায়ণ, জানুয়ারি, ২০০৯, অপর্ণা বুক ডিস্ট্রিবিউটার্স, কলকাতা – ০৯, পৃ. ১৯৯
১৪. বিভীষণ, দীপক চন্দ্র, প্রথম দে'জ সংস্করণ, দে'জ পাবলিশার্স, ডিসেম্বর, ২০০৫, পৃ. ৯৭
১৫. তদেব, পৃ. ১৪৭